লালগড় আন্দোলন প্রসঙ্গে বিতর্ক

যোগেন বর্মণ

সম্প্রতি লালগড় আন্দোলন নিয়ে কিছু চর্চা ও বিতর্ক চলছে। এটা একটা ভালো বিষয় কারণ লালগড় আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন যা একসময় গোটা দেশে আলোড়ন তুলেছিল ও আলোচনার বিষয় হিসাবে দাঁড়িয়েছিল। তার বিচার বিশ্লেষণ জরুরী। তাছাড়া অতীতের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ ভবিষ্যতের পথকে সুগম করে ও মতামতের বিভিন্নতার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে তথা সঠিক চিন্তাধারা গড়ে ওঠে - এটা একটা বৈজ্ঞানিক নিয়ম।

শুরুতেই এটা বলে দেওয়া ভালো সি পি আই (এম.এল.) নিউ ডেমোক্রেসি (সংক্ষেপে নিউ ডেমোক্রেসি) বরাবরই ঐতিহাসিক লালগড় আন্দোলনকে জনসাধারণের এক মহান আন্দোলন হিসাবে সমর্থন করে গেছে। তারা আন্দোলনের মধ্যে ঘটা ত্রুটি বিচ্যুতিগুলিকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিশ্লেষণ করেছে ও সংশোধনের পক্ষে মতামত দিয়ে এসেছে। সি পি আই (এম.) সহ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা যেভাবে লালগড় আন্দোলনকে কদর্যভাবে চিত্রিত করেছে ও দখলের চেষ্টা চালিয়েছে নিউ ডেমোক্রেসি লাগাতার তার তীব্র বিরোধিতা করেছে। আবার জনসাধারণের এই আন্দোলনকে সমর্থনের নামে যারা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সঙ্গে সমভাবে অরাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের (সিপিএমের নয় 'মাওবাদীদের') সক্রিয়ভাবে বিরোধিতার লাইন নিয়েছিল নিউ ডেমোক্রেসি তারও বিরোধিতা করেছিল। একথা হয়তো অনেকেরই জানা নেই যে নিউ ডেমোক্রেসি লালগড় আন্দোলনে শুধুমাত্র যে সংহতিমূলক কার্যকলাপ করেছে তাই নয়, আন্দোলনের বৃহত্তম পরিধির এলাকায় যেখানে নিউ ডেমোক্রেসির কিছু সংগঠন আছে সেই সারেঙ্গা, গোয়ালতোড় ইত্যাদি এলাকায় সক্রিয়ভাবে রাস্তা অবরোধ সহ বিভিন্ন আন্দোলন ও কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, এমনকী আন্দোলনের নেতৃত্ব জনসাধারণের কমিটির কেন্দ্রীয় স্তরে একটা সময় পর্য্যন্ত নিউ ডেমোক্রেসির প্রতিনিধিত্ব ছিল। আন্দোলনে কিছু অনভিপ্রেত ঘটনাকে দেখিয়ে একসময় নিউ ডেমোক্রেসির পক্ষ থেকে এই প্রতিনিধিদের সরিয়ে নেওয়া হয়। কেন এমনটা ঘটল তা নিউ ডেমোক্রেসির অভ্যন্তরীণ আলোচনার বিষয়। তথাপি এ আত্মসমালোচনা করা প্রয়োজন যে সরে আসার এ সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। যেহেতু তখনো পর্যন্ত ব্যাপক মানুষ জনসাধারণের কমিটির নেতৃত্বে আন্দোলনে সামিল ছিলেন, কাজেই তখনকার বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে কমিটির মধ্যে থেকেই আন্দোলনকে শক্তিশালী করার প্রয়াস নেওয়া উচিত ছিল, আন্দোলনের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ও কমিটিকে সঠিক পরামর্শ দিয়ে আন্দোলনকে সঠিক দিশায় এগিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট থাকা উচিত ছিল। অবশ্য কোনো রকম মনগড়া কল্পনা না করে নির্দ্বিধায় এটা বলা যায় যে, যেহেতু মূল লালগড় এলাকায় নিউ ডেমোক্রেসির কোন সংগঠন ছিল না ও সিপিআই (মাওবাদী) বা (সংক্ষেপে 'মাওবাদীরা) ছিল আন্দোলনের নির্ধারক শক্তি, ফলে ভুল সংশোধনের ব্যাপারে তাদের সক্রিয় সহায়তা ছাড়া নিউ ডেমোক্রেসির কমরেডরা সামগ্রিক আন্দোলনকে কতটা প্রভাবিত করতে পারতেন সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবুও কমিউনিস্ট আন্দোলনে 'বাম' ও 'দক্ষিণ' বিচ্যুতি তথা সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় মতাদর্শগত সংগ্রামের ইতিহাস সম্পন্ন নিউ ডেমোক্রেসির কমরেডদের সঠিক ভূমিকা পালন করা উচিত ছিল, যেমনটা তারা করেছিলেন অন্য অনেকের মত তথাকথিত 'মমতা হাওয়ায়' ভেসে না গিয়ে বা রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির প্রশ্নে রিভিউ কমিটি সম্পর্কে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে সক্রিয় রাজনৈতিক বিতর্ক চালিয়ে।

লালগড় আন্দোলন সম্পর্কে যে আলোচনাগুলো চলছে তার একটি উল্লেখযোগ্য বক্তব্য এসেছে সিপিআই (মাওবাদী)-র কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্বাঞ্চলীয় ব্যুরোর নামে প্রচারিত এক প্রচারপত্রের মাধ্যমে, যার শিরোনাম হচ্ছে 'পার্টি প্রতিষ্ঠার দশমবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কাছে সিপিআই (মাওবাদী)-র আহ্বান' এই প্রচারপত্রের প্রামাণ্যতা আমাদের পক্ষে যাচাই করা সম্ভব নয়। কিন্তু যেহেতু এটা ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হয়েছে ও এটাকে অস্বীকার করে মাওবাদীদের পক্ষ থেকে কোনো বিবৃতি আসেনি, আমাদের পক্ষে এই প্রচারপত্রের প্রামাণ্যতা ধরে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। তা সত্ত্বেও অন্যান্য বক্তব্য নিয়ে নয়, আমরা প্রধানত সীমাবদ্ধ থাকব লালগড় আন্দোলন সম্পর্কে এই প্রচারপত্রের বক্তব্যের ব্যাপারে। এই প্রচারপত্রে বলা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে তারা বিস্তারিত ভাবে তাদের পার্টি

ও আন্দোলনের মূল্যায়ন করবেন। আপাতত সংক্ষেপে তারা তাদের কিছু মূল্যায়ন রেখেছেন বলেই তারা জানাচ্ছেন। স্বাভাবিকভাবেই, তাদের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন পাওয়ার পরই আমরা সে সম্পর্কে আমাদের অবস্থান নির্দিষ্ট করতে পারব। আপাতত যে বিষয়গুলো এই প্রচারপত্রের মাধ্যমে এসেছে, তার ভিত্তিতেই আমরা আমাদের কিছু প্রাথমিক মন্তব্য রাখব।

এছাড়া র‍্যাডিকালের পক্ষ থেকে প্রচারিত 'কিছু কথা, কিছু ভাবনা, কিছু প্রশ্ন' শীর্ষক একটি প্রচারপত্র ও তার জবাবে একটি রিভলিউশনারী উদ্যোগের নামে সৌভিকের লেখা, 'ভাগো মৎ দুনিয়াকো বদলো' - শীর্ষক একটি লেখা বিশেষ ভাবে প্রচারিত হচ্ছে। যেহেতু এই প্রচারপত্রগুলোর মূল কেন্দ্রে আছে লালগড় আন্দোলন কাজেই সে সম্পর্কেও আমরা কিছু সংক্ষিপ্ত মতামত রাখার চেষ্ঠা করবো। এই প্রচার পত্রগুলোর অন্যান্য বক্তব্যগুলো যা সরাসরি লালগড় আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সে বক্তব্যগুলোয় মতামত না দিতে বা সেগুলো এড়িয়ে যেতে আমরা চেষ্টা করব। আবার বর্তমান এই লেখাটি লালগড় প্রসঙ্গে আমাদের সামগ্রিক বক্তব্য এভাবে দেখাটাও ভুল হবে। লালগড় আন্দোলন প্রসঙ্গে যে বিষয়গুলি আপাতত সামনে হাজির হয়েছে সে সম্পর্কে আমাদের মতামত এভাবেই গণ্য করাটা ঠিক হবে। আরো কিছু বিষয়, যেমন আন্দোলনে যুক্তফ্রন্টের প্রশ্ন 'ঝাড়খন্ডী' ও 'নকশালপন্থী' কিছু সংগঠনের সঙ্গে 'মাওবাদীদের বিরোধ, জ্ঞানেশ্বরী প্রকরণ ইত্যাদি প্রশ্নগুলি খুবই প্রাসঙ্গিক। সার্বিক মূল্যায়নের প্রশ্ন যখন আসবে তখন এই বিষয়গুলি বিবেচনায় আসা উচিত বলে আমরা মনে করি।

নির্দিষ্ট আলোচনায় ঢুকতে গিয়ে প্রথমেই এটা বলব যে, লালগড় আন্দোলনকে নিপীড়িত জনসাধারণের এক বিদ্রোহ, পুলিশী তথা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনগণের এক অভ্যুত্থান, গ্রামে গ্রামে অবদমিত মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ইত্যাদি নিয়ে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু যে ব্যাপারটায় আমাদের মতপার্থক্য আছে তা হল, এই মূল্যায়ন যে সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের মত লালগড় হচ্ছে জবরদস্তী জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে মানুষের এক সংগ্রাম। এরকম একটা মতামত গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে প্রচারিত আছে। আমরা এই ধরনের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়েই এগোতাম, কিন্তু যখন দেখি 'মাওবাদীদের' নামে প্রচারিত আলোচ্য প্রচারপত্র থেকেও এ ধরনের এক ধারণা বেরিয়ে আসছে তখন বিষয়টি আমরা এড়িয়ে যেতে পারছি না। ঐ প্রচারপত্রে বলা হয়েছে, ''একথা আজ কারো অজানা নেই যে, তৎকালীন কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার ও সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকার অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে কলকারখানা তৈরী করার নামে দুনিয়ার বড় বড় কর্পোরেট আর ভারতের মুৎসুদ্দী আমলাতান্ত্রিক পুঁজিপতিদের স্বার্থে কৃষকদের জমিগুলি জোর জবরদস্তী অধিগ্রহণের ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। এর বিরুদ্ধে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, লালগড়ে একের পর এক জঙ্গী সংগ্রাম তথা বিদ্রোহ ফেটে পড়ে।" এক্ষেত্রে বলার কথা এই যে, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের কথা সবাই জানি কিন্ত লালগড়ে মানুষ জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে জঙ্গী সংগ্রাম তথা বিদ্রোহ করেছে এটা আমাদের সবার অজানা। কেউ কেউ কষ্টকল্পিত ভাবে শালবনীতে জিন্দালের প্রস্তাবিত স্টিল প্লান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান থেকে ফেরৎ মুখ্যমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কনভয়ের উপর মাইন বিস্ফোরণ ও তার ফলশ্রুতিতে লালগড়ে পুলিশী সন্ত্রাস এবং তার বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থানকে যুক্ত করে মাইন বিস্ফোরণ সহ গোটা বিষয়টিকে জবরদস্তী জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে সার্বিক এক জঙ্গী সংগ্রাম তথা বিদ্রোহ হিসাবে চিহ্নিত করেন। আমরা তার সঙ্গে একমত নই। শালবনীতে প্রস্তাবিত জিন্দালের স্টিল প্রকল্পের জন্য কতটা জমি সংগৃহীত হয়েছিল তা নিয়ে নানা জনে নানা হিসেব দিয়েছেন। তবে মোটামুটি সবাই একমত যে এই পরিমাণ চার হাজার একর থেকে পাঁচ হাজার একরের মাঝে। তার মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী জমি ছিল সরকারী জমি বাকি জমি জিন্দালরা কেনেন। কাজেই এখানে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি থেকে জবরদস্তী উচ্ছেদের বিষয় ছিল না যেমনটা ছিল সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রামে। আগে কোনোদিন জনগণকে জমি থেকে উচ্ছেদ করে সরকার তার মালিকানা কায়েম করেছিল কিনা সেটা পৃথক বিষয়। সরকারী জমির বড় অংশই জঙ্গল, গোচারণ-ভূমি, খাস বা পতিত ছিল। এখানে সমস্যাটা থাকতে পারে জঙ্গল, খাস ও পতিত জমি, গোচারণভূমি ইত্যাদির অধিকার থেকে আদিবাসী, ক্ষেতমজুর, গরীব কৃষকদের বঞ্চিত করে সেই জমি কারখানার নামে বৃহৎ পুঁজিপতিকে দেওয়ার। পরিবেশ দূষণের প্রশ্নটিও থাকতে পারে। অন্যদিকে ক্রীত জমির ক্ষেত্রে পাট্টাদার (বর্গাদার সহ) ও কর্মরত কৃষিমজুর উচ্ছেদ, আদিবাসীর জমি হস্তান্তর ইত্যাদি বিষয়গুলোও থাকতে পারে। এসব প্রশ্ন আন্দোলনের ইস্যু হওয়ার সম্ভাবনাও থাকতে পারে বা প্রস্তাবিত প্রকল্পকে সেজ প্রকল্প করার বিরুদ্ধেও সংগ্রামের সম্ভাবনা থাকতে

পারত। কিন্তু বাস্তব যেটা তা হল,শালবনী জিন্দাল প্রকল্পের বিরুদ্ধে সেরকম কোনো আন্দোলন দৃশ্যপটে আসেনি, বা দানা বাঁধে নি বা দীর্ঘস্থায়ী অথবা ব্যাপক রূপ নেয় নি। দ্বিতীয়ত লালগড়ের ঐতিহাসিক আন্দোলনে কখনই জমি অধিগ্রহণ বিষয়টি বিশেষ দাবি হিসাবে উঠে আসে নি। সংগ্রামের শুরুতে যখন প্রকাশ্য সামনের নেতৃত্ব হিসাবে 'পুলিশী সন্ত্রাসবাদ বিরোধী জনসাধারণের কমিটি' (সংক্ষেপে জনসাধারণের কমিটি) গড়ে ওঠে, তার প্রচারিত ১৩ দফা দাবিপত্রে কোথাও জমি অধিগ্রহণ বিষয়টি নেই বরং একটি দাবি এরকম যে শশধর মাহাতো শালবাড়ি বিস্ফোরণ কান্ডে জড়িত ছিলেন না ও তার উপর থেকে অভিযোগ প্রত্যাহার করা হোক।

প্রসঙ্গত, আরেকটি বিষয়ে মতামত রাখা প্রয়োজন মনে হল। উক্ত 'মাওবাদী' প্রচারপত্রে বলা হয়েছে ''একথা সত্য যে সামাজিক ফ্যাসিবাদী সিপিএম, হার্মাদ বাহিনী ও কেন্দ্র রাজ্য পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী, এই প্রতিক্রিয়াশীল আঁতাতের সম্মিলিত আক্রমণে সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের উপরিউক্ত সংগ্রামগুলি সাময়িকভাবে হলেও কিছুটা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। অপরদিকে, এই সমস্ত আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে অসীম আলোড়নকারী লালগড় গণবিদ্রোহ গড়ে ওঠে।'' সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের আন্দোলন পৃথক কোনো সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার আন্দোলন ছিল না। এগুলি ছিল আংশিক আন্দোলন। এগুলি ছিল জবরদস্তী জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে তথা মানুষের জমি, জীবিকা, বাসস্থান ইত্যাদি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন। কাজেই আন্দোলনের জয়-পরাজয়, অগ্রগমন - পশ্চাদপসরণ নির্ধারিত হবে সেই নিরিখে, অন্য কোনো মাপকাঠিতে নয়। সিঙ্গুরের ক্ষেত্রে আমরা সবাই জানি, মানুষ জমি ফেরৎ পান নি। জমি জবরদস্তী অধিগ্রহণ করে সরকার তা টাটার হাতে তুলে দিলেও টাটা সেখানে কারখানা করতে পারেন নি বা অন্য কিছু করতে পারেন নি, বিষয়টি মামলায় ঝুলছে। অর্থাৎ এখনো সেখানে কোনো পক্ষেরই চূড়ান্ত জয়-পরাজয় হয় নি। কিন্তু নন্দীগ্রামে অবস্থাটি তা নয়। এখানে সরকার জমি অধিগ্রহণ করতে বা সালেমের হাতে তুলে দিতে পারেন নি। জনগণের জমির মালিকানা বা দখল সুনিশ্চিত। এখানে নিশ্চিতভাবে সরকার পক্ষ বা পুঁজিপতি পক্ষ পরাস্ত—জনগণ জয়ী। হতে পারে গ্রাম দখলের লড়াইয়ে একটা সময়ে অস্ত্র ও প্রশাসনের জোরে দু'একবার সিপিআই(এম) 'সফল' হয়েছিল বিপরীত পক্ষ 'পিছু হটেছিল', যদিও সিপিআই(এম) এর সেই 'আধিপত্য' বেশিদিন টেঁকে নি। হতে পারে বা বাস্তবত হয়েছে যে আন্দোলনে বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি বা আন্দোলন জনগণের রাজ গড়ার দিকে চালিত হয় নি বা আন্দোলনের সুফলগুলিকে মূলত তৃণমূল কংগ্রেস আত্মসাৎ করেছে। কিন্তু আন্দোলন শুরু হয়েছিল মূল যে দাবি নিয়ে অর্থাৎ জবরদস্তী জমি অধিগ্রণের বিরুদ্ধে সেক্ষেত্রে সরকারকে জনগণের জঙ্গী প্রতিবাদের সামনে পিছু হটতে হয়েছে। তাহলে যেমনটি 'মাওবাদী' প্রচার পত্রে লেখা হয়েছে, আন্দোলনের 'সাময়িক পশচাদপসরণ', সেই প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? অবশ্য নন্দীগ্রাম থেকে 'মাওবাদীদের' পশচাদপসরণকে যদি আন্দোলনের পশচাদপসরণ হিসাবে দেখা হয় তবে তা পৃথক কথা। এখানে আর একটা ব্যাপার বলা দরকার— তা হলো সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের আন্দোলন মানুষকে শুধু শিক্ষাই দেয় নি, এগুলো পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটাই পাল্টে দিয়েছিল। সিপিআই (এম) - এর নিরঙ্কুশ আধিপত্য, সিপিআই (এম) ই শেষ কথা কোনো বিকল্পের স্থান নেই, বাংলায় এই অবস্থা তথা সিপিআই (এম) এর সন্ত্রাসের রাজত্বের ভিতটাকেই টলিয়ে দিয়েছিল। বিশেষত নন্দীগ্রামের আন্দোলন ও সেখানে মানুষের কাছে সিপিআই (এম) সরকারের পরাজয় তথা পশচাদপসরণ সিপিআই (এম) - এর রাজনৈতিক, সাংগঠনিক আধিপত্যকেই তছনছ করে দিয়েছিল। ফলে গোটা পশ্চিমবাংলায় জনগণ উৎসাহিত হয়েছিলেন। আন্দোলনের সাময়িক স্থবিরতা কাটিয়ে 'বাম' সরকারকে সার্বিক চ্যালেঞ্জ জানানো ও দুর্বার গণ আন্দোলন গড়ে ওঠার এক সুবর্ণসুযোগ হাজির হয়েছিল। সিপিআই (এম) সরকার জনগণ থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সমসাময়িক ভাবে গড়ে উঠল রেশন দুর্নীতি বিরোধী সংগ্রাম সহ বিভিন্ন ইস্যুতে একের পর এক উল্লেখযোগ্য সংগ্রাম। যেমন রিজানুর রহমন প্রকরণ, হরিপুর তাপ বিদ্যুৎ বিরোধী সংগ্রাম ইত্যাদি। এই প্রেক্ষাপটেই লালগড় আন্দোলন গড়ে ওঠে যেখানে আদিবাসী সহ বিভিন্ন অবদমিত মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামে জেগে ওঠেন। অবশ্যই এই সংগ্রাম সংগঠিত করতে 'মাওবাদীদের' ভূমিকা ছিল। দুঃখের বিষয় কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা গোটা বাংলায় আন্দোলনের অনুকূলে এই সুযোগের যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি ও বিরোধ শাসকবর্গীয় পার্টি TMC মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ক্ষমতায় এসে আন্দোলনের স্ফুলিংগগুলোকে একের

পর এক নেভাতে সাময়িকভাবে সফল হন। পরিতাপের বিষয় এই যে সংশোধনবাদের তকমাপ্রাপ্ত অন্যান্য কমিউনিষ্ট বিপ্লবীরা তো পশ্চিমবঙ্গে বিপ্লবী আন্দোলনের কোনো এলাকা তো সৃষ্টি করতে পারলেনই না বা সৃষ্টি করলেন না এমনকী মাও সে তুং - এর মতবাদের প্রকৃত উত্তরসূরী বলে দাবি করা 'মাওবাদীরা' সম্পূর্ণ সুযোগ পেয়েও লালগড় আন্দোলনকে বাস্তবত মমতা ব্যানার্জীদের হাতে সঁপে দিলেন। আজ সব কিছু তলানীতে পৌঁছানোর পর তাদের আত্মসমালোচনা কতটা জনগণকে প্রভাবিত করে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবে ও নতুন আশা জাগাবে তা তো ভবিষ্যতই বলবে।

এবার আমরা এগোতে পারি মাওবাদী প্রচারপত্রের লালগড় সম্পর্কিত অন্যান্য বক্তব্যে। প্রচারপত্রে বলা হয়েছে, "বাস্তব ক্ষেত্রে লালগড় আন্দোলন হচ্ছে শোষণমূলক এবং অত্যাচারী এই সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক অভূতপূর্ব গণ বিদ্রোহ। লালগড় আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমস্ত দমনমূলক দিকগুলোকে অগ্রাহ্য করে এক বিকল্প অর্থনৈতিক রাজনৈতিক তথা সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া। লালগড় আন্দোলন দেখিয়ে দিয়েছে কিভাবে গ্রামে গ্রামে এলাকায় এলাকায় তথা বিশাল গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী গণ কমিটি গড়ে তুলে জনগণের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়। লালগড়ের জনগণ সেই ক্ষমতার বলে জল-জঙ্গল-জমি-কৃষিবিকাশ-বিচারব্যবস্থা - শিক্ষা - স্বাস্থ্য - সংস্কৃতি - প্রতিরক্ষা ইত্যাদি সমস্ত কিছু নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ লালগড়ের জনগণ নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে নিজেদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বাদ পেয়েছেন। এটাই হচ্ছে লালগড়ের আন্দোলনের ঐতিহাসিক উপলব্ধি।" এই বক্তব্য সম্পর্কে বলা যায় যে অবশ্যই লালগড় আন্দোলন দীর্ঘদিনের শোষণ নির্যাতন বঞ্চনার ক্ষোভ সঞ্জাত এক বিদ্রোহ যা প্রচলিত শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চালিত হয়েছিল। অবশ্য ব্যকরণগত ভাবে অভূতপূর্ব (যা আগে কখনও ঘটে নি) বলা ঠিক নয়। যুগে যুগে নিপীড়িত মানুষ বারবার বিদ্রোহ করেছে যা প্রচলিত শোষণ নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা ভাঙ্গার চেষ্টা করেছে ও নিপীড়িত মানুষের রাজ কায়েম করার চেষ্টা করেছে। বলা যেতে পারে লালগড় আন্দোলন এই সব আন্দোলনের অনুসারী। বিশেষ করে আজও সিধু কানুর নেতৃত্বাধীন হুল বিদ্রোহ আদিবাসীদের আলোড়িত করে। এটাও ঘটনা যে লালগড় আন্দোলনে গ্রামে গ্রামে গণকমিটি গড়ে ওঠা ও তাদের কর্তৃত্ব স্থাপনের বিষয়গুলি ছিল। কারও কারও সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমরা এটা বলি না যে জনগণের কর্তৃত্ব নয় 'মাওবাদীদের কর্তৃত্ব' কারণ আমরা জানি জনগণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সেই পার্টির নেতৃত্ব স্বাভাবিক যার সেখানে জনাধার আছে। এখানে প্রশ্ন একটাই তা হোল গণকমিটির মধ্যে শ্রেণিগত নেতৃত্বের প্রশ্ন অর্থাৎ বিপ্লবী গণকমিটির মধ্যে গ্রামাঞ্চলের গরীব ভূমিহীন কৃষকদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিনা? বাকি বিষয়গুলি অর্থাৎ জল-জঙ্গল-জমি-কৃষিবিকাশ-বিচারব্যবস্থা-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সংস্কৃতি-প্রতিরক্ষা ইত্যাদি নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী অর্থাৎ নিপীড়িত জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী গড়ে তোলার চেষ্টা সম্পর্কে বলা যায় সেরকম মনোবাসনা বা চেষ্টা নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা দখল, নিদেন পক্ষে ঘাঁটি এলাকাস্থাপন ছাড়া এই ইচ্ছে ফলবতী হওয়া কার্যত অসম্ভব ছিল। লালগড়ে ঘাঁটি এলাকা গড়া যেত কিনা তা অবশ্যই গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা দরকার। আমরা তাদের সঙ্গে একমত নই যারা বলেন যে আজকের উন্নত প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগে চীনা পথ অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের মাধ্যমে ঘাঁটি এলাকা স্থাপন, গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা ও পরিশেষে শহরগুলি দখলের মাধ্যমে দেশব্যাপী ক্ষমতা দখল - এটা আর সম্ভব নয়। আমরা মনে করি ভারতের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি হিসেবে রেখে সেই অনুযায়ী আশু কর্মকৌশল গ্রহণ করে দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ ঘাঁটি এলাকা গঠন তথা চীনা পথ অনুযায়ী ভারতের বিপ্লব সম্পন্ন হবে। এই পরিসরে সে বিতর্কে আমরা ঢুকবো না যেহেতু আশু কর্মকৌশলের বিষয়টি বাদ দিয়ে মূল রণনীতিগত প্রশ্ন অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল তা নিয়ে মাওবাদীদের সঙ্গে আমাদের কোন মৌলিক মতবিরোধ নেই। লালগড় সংগ্রামের সাফল্যের বিষয়গুলো তো আমাদের অতি অবশ্যই তুলে ধরতে হবে কিন্তু এই সংগ্রামের অগ্রগতি, দিশা, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি প্রশ্নগুলো যখন আলোচিত হবে তখন এই কথা নিশ্চয়ই আসবে লালগড়ে ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলা যেত কিনা কারণ আন্দোলন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না ও শত্রুর ব্যাপক আক্রমণের সামনে দাঁড়িয়ে ঘাঁটি এলাকা না গড়ে এই ধরনের আন্দোলন কোনো এলাকায় দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখা কার্যত অসম্ভব।

যেটা মাওবাদী প্রচারপত্রে বলা হয়েছে যে 'লালগড়ের জনগণ নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে নিজেদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বাদ পেয়েছেন' - এভাবে বলাটা বেশ বাড়িয়ে বলা ও ভবিষ্যৎ সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে ভুল ধারনা প্রচার কার। চাঁদা তুলে বা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কিছু ছোটখাটো নলকূপ, কিছু কাঁচা রাস্তা, ছোটো বাঁধ, ছোটো স্বাস্থ্য কেন্দ্র ইত্যাদি গড়া জনগণের অর্থনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ভ্রূণ— এভাবে দেখাটা মার্কসবাদ সম্মত নয়। এসবগুলো পুরোনো ব্যবস্থাকে না ভেঙেই কিছু সংস্কার। অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা সামাজিক সংস্থাও এ ধরনের কাজ করে থাকে। পুরোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উৎপাদন সম্পর্ক বা মালিকানা সম্পর্ককে না ভাঙলে নতুন অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা হয় না। সেই নতুন অর্থনীতিই থাকে নতুন রাজনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থার মূলে। লালগড় আন্দোলনে পুলিশ বা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হয়েছে। সিপিআই (এম) - এর সন্ত্রাস ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হয়েছে। কিছু অর্থনৈতিক সংস্কার হয়েছে কিন্তু সম্পত্তিবান শোষক শ্রেণিগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম হয়েছে বা সেধরনের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সমস্যা বা দাবি নিয়ে সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছে বা তাদের আধিপত্য চুরমার করা হয়েছে এরকম কর্মসূচী নেওয়া হয় নি। কোনো বিশেষ এলাকায় সেরকম কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ বা উদ্যোগ থাকলেও তা কখনোই সার্বিক রূপ হিসাবে আসেনি। ফলে শ্রেণিসংগ্রাম প্রকৃত অর্থেই তীব্রতর হয়নি ও শোষক শ্রেণির প্রতিভূরা বিচ্ছিন্ন হয় নি। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন জায়গায় জনগণের কমিটিগুলোর মধ্যে TMC - এর লোকজন গেড়ে বসবে ও আন্দোলনের সুফলগুলোকে হাতিয়ে নিয়ে আন্দোলনকে বিপথচালিত করবে এতে আর আশ্চর্য কি? এখানেই নকশালবাড়ির সঙ্গে লালগড়ের অন্যতম পার্থক্য। নকশালবাড়িতে জমিদার, জোতদার, মহাজনদের সম্পত্তি সম্পর্ক ও কর্তৃত্বকে ভেঙ্গে চুরমার করা হয়েছিল ও তাদের বাঁচাতে আসা পুলিশ বা রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। অপরদিকে লালগড়ে আন্দোলন বিপরীত দিক থেকে শুরু হলেও অর্থাৎ পুলিশ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হলেও তা সামন্তবাদ বা সম্পত্তিবান শোষক শ্রেণিগুলোর বিরুদ্ধে সার্বিক সংগ্রামে পরিব্যাপ্ত হয় নি। একথা অনস্বীকার্য যে কোনো গণসংগ্রাম বিশুদ্ধ ফরমূলা মেনে গড়ে ওঠে না ও যে কোন ইস্যু নিয়েই জনগণের সংগ্রাম ফেটে পড়তে পারে। কিন্তু লালগড়ের সংগ্রাম যেহেতু একটি নির্দিষ্ট অভিমুখে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি ছিল কাজেই সংগ্রামটিকে দীর্ঘস্থায়ী রূপ দেওয়া, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য কৃষিবিপ্লবের কর্মসূচী হাতে নেওয়া উচিত ছিল ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ধাপে ধাপে সংগ্রামকে সেদিকে চালিত করার জন্য প্রয়াস নেওয়ার দরকার ছিল। নকশালবাড়ি ও লালগড় আন্দোলনের ফারাক না বুঝে ও কৃষিবিপ্লবী কর্মসূচীকে গুরুত্ব না দিয়ে কেউ কেউ লালগড় আন্দোলনকে নকশালবাড়ির বিকশিত রূপে হিসাবে চিহ্নিত করেন যেমন রিভিলিউশনারী উদ্যোগের সৌভিক তার প্রচারপত্রে বলেছেন। খুব নরমভাবে বললে এটা হচ্ছে পরিমিতি বোধের অভাব বা অন্যভাবে বললে তালজ্ঞান হারিয়ে ফেলা— কার্যত নকশালবাড়ির অবমূল্যায়ণ করা।

কেউ কেউ পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে সামন্তবাদ নেই, সামান্য কিছু অবশেষ আছে, এভাবে দেখে-আমরা তার সঙ্গে একমত নই। গণ আন্দোলন তথা কৃষক আন্দোলনের চাপে ভারতের অন্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে কিছু বেশী 'ভূমি সংস্কার' অর্থাৎ সিলিং এর মাধ্যমে কিছু বেশী জমি খাস হওয়া বা বন্টন হলেও এখনো মৌলিক ভূমি সংস্কার হয় নি বা কৃষকের হাতে জমি এই দাবি কার্যকর হয় নি। এখনো জোতদার বা অকৃষক জমি মালিকরা সাধারণভাবে কমপক্ষে সাড়ে বারো একর সেচসেবিত ও সাড়ে সতেরো একর অসেচ জমি রাখতে পারে পরিবার পিছু। এই অবস্থায় এখনো পশ্চিমবঙ্গে পৃথক পরিবার দেখিয়ে ও ভূমি সংস্কার আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে জোতদার ও স্বচ্ছল অকৃষক জমি মালিকদের হাতে অনেক জমিই আছে যেখানে ভূমিহীন পরিবার সংখ্যা বাড়ছে। এখনো বর্গাদারদের জমির উপর কোনো মালিকানা নেই। কাজেই জমির প্রশ্ন, কৃষিবিপ্লবের প্রশ্ন এবং তা নিয়ে সংগ্রাম এখনো পশ্চিমবঙ্গে অচল হয়ে যায় নি। এখানে সেই বিতর্কে ঢোকার কোনো অবকাশ নেই। হতে পারে যে লালগড়ের কোনো কোনো এলাকা জঙ্গলাকীর্ণ হওয়া তথা আদিবাসী জনতার বহুল বসতির কারণে, আদিবাসীর জমি অ-আদিবাসীদের কেনার উপর আইনী বিধিনিষেধ থাকার কারণে সেরকম কোন জোতদার বা অকৃষক স্বচ্ছল জমি মালিক নেই কিন্তু গোটা জঙ্গলমহল এলাকায় কোন সামন্তবাদ নেই, জোতদার মহাজন নেই বা জমি সমস্যা নেই বা জমি নিয়ে সংগ্রামের পরিস্থিতি নেই এটা আমরা মানতে পারলাম না। এমনকী জঙ্গল এলাকায় যেখানে সরাসরি কোন জোতদার নেই

ভারতের আদিবাসী ও অন্যান্য জনগণ এরকম বিভিন্ন এলাকাতেও জঙ্গলের জমির অধিকার নিয়ে লড়াই চালাচ্ছেন। মূল কথাটি হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে জনগণের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বদলের কথা যখন আসছে কৃষি বিপ্লবের কর্মসূচী ছাড়া তা অর্থহীন। অর্থনীতিগত ভাবে কৃষি বিপ্লবের প্রধান বিষয় বা মূল বিষয় অবশ্যই কৃষকের হাতে জমির প্রশ্ন। তার পাশাপাশি কৃষকের বিভিন্ন সংগ্রামগুলো অর্থাৎ উচ্চতর মজুরীর জন্য সংগ্রাম, মহাজনী বিরোধী সংগ্রাম, জোতদার, মহাজন, ব্যবসায়ীদের কাছে কৃষকদের ঋণ বাতিলের সংগ্রাম, বিভিন্ন ধরনের খাজনা কমানোর সংগ্রাম, খাস পতিত ও সর্বসাধারণের জমি নিয়ে সংগ্রাম, বেগার খাটার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জঙ্গল ঠিকাদার ও অফিসারদের বিরুদ্ধে আদিবাসী ও অন্যান্য জঙ্গল বাসীদের সংগ্রাম, কৃষি সরঞ্জামের দাম কমানো তথা কৃষি পণ্যের লাভজনক দরের সংগ্রাম, বিদ্যুৎ সেচ ইত্যাদির দাবিতে সংগ্রাম ইত্যাদি সব ধরনের সামন্তবাদ বিরোধী সরকার বিরোধী কৃষক সংগ্রামগুলো হচ্ছে কৃষিবিপ্লবী সংগ্রামের অংশ। জমির লড়াইটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা সাধারণতঃ শুরু হয় খাস, বেনামী ইত্যাদি জমির লড়াই থেকে এবং সর্বোচ্চ রূপ পায় জমিদারদের নিজস্ব জমি দখলের লড়াইয়ের মধ্যে। এটা হচ্ছে অর্থনৈতিক দিক, যেখানে কৃষি বিপ্লবের রাজনৈতিক দিকগুলো গ্রামাঞ্চলে সম্পত্তিবান শ্রেণিগুলোর কর্তৃত্বকে ভেঙে গরীব ভূমিহীন কৃষক তথা জনগণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। স্বাভাবিক ভাবেই কৃষি বিপ্লব সম্পন্ন করতে গরীব ভূমিহীন কৃষক তথা কৃষিমজুররাই সবচেয়ে বেশী আগ্রহী, তারাই কৃষি বিপ্লবী সংগ্রামকে শেষ পর্য্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর থাকে, যেখানে মাঝারী কৃষকরা হল দোদুল্যমান মিত্র। ফলে গ্রামাঞ্চলের কৃষি বিপ্লবী সংগ্রাম ও জনগণের ক্ষমতার সংস্থাগুলোতে দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা একান্ত জরুরী। লালগড়ে যেভাবে শ্রেণি লাইনের ব্যাপারে কম জোর পড়েছে যেখানে এমনকী নেতৃত্ব মমতা ব্যানার্জীর শ্রেণি-চরিত্র বুঝতে পারেন নি, সেখানে আন্দোলনে গরীব ভূমিহীনদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিষয়টি যে সেভাবে গুরুত্ব পায়নি তা বোঝাই যায়। এখানে একটা কথা বলে নেওয়া ভালো যে বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণি বা সর্বহারার নেতৃত্বের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে কৃষক সংগ্রামে ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকের নেতৃত্বের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নেই বরং তা একে অন্যের পরিপূরক।

'মাওবাদী' প্রচারপত্রের আরো কিছু বিষয়ে যাওয়ার আগে আমরা আরো দুটো বক্তব্য অর্থাৎ র‍্যাডিক্যালের প্রচারপত্র ও তার জবাবে সৌভিকের লেখা নিয়ে কিছু আলোচনা করে নিতে পারি।

র‍্যাডিক্যালের কিছু কথা, কিছু ভাবনা, কিছু প্রশ্ন নামক প্রচারপত্রে বিপ্লবী আন্দোলন তথা লালগড় আন্দোলনের কিছু সারসংকলনের চেষ্টা করেছেন। আমরা লালগড়ের ব্যাপারটায় বিশেষ জোর দেব, তবু কথা প্রসঙ্গে দুটো একটা কথা বললে আশা করি খারাপ হবে না। র‍্যাডিক্যাল নিজেদের মার্কসবাদী হিসাবে ঘোষণা করেছেন, লালগড় সহ বিভিন্ন গণজাগরণকে সমর্থন করেছেন এটা ভালো কথা। তবে তাদের লেখায় কাব্যিক ধরন দেওয়ার চেষ্টার জন্য হোক, বিষয়গুলোকে সরস করা, ব্যঙ্গাত্মক ধরন আনা বা নতুনত্ব আনার চেষ্টার জন্য হোক কখনও কখনও মার্কসবাদী লেখাপত্রে প্রতিষ্ঠিত ধ্যানধারনাকে লঙ্ঘন করা হয়েছে। কিছু বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন সর্বহারা একনায়কত্ব, বিপ্লবী সংগ্রাম ইত্যাদি। র‍্যাডিক্যালরা লিখেছেন - 'সর্বহারা একনায়কত্ব কি? সর্বহারা একনায়কত্বের ধারনা মানে বিকল্পের ধারনা'। শ্রেণিগত একনায়ত্বকে বিকল্পের ধারনা হিসাবে পেশ করা একেবারেই উচিত নয়। 'বিকল্প' কথাটি গোলমেলে গোলগাল কথা। বিকল্পের ব্যকরণগত অর্থ কোনো কিছুর বদলে অন্য কিছু। সোনার বিকল্প গোল্ড বন্ড, জৈবিক প্রোটিনের বিকল্প ভেষজ প্রোটিন, দুধের বিকল্প মিল্ক পাউডার, নিয়মিত সদস্যের বিকল্প অতিরিক্ত সদস্য, ধোনীর বিকল্প কোহলী ইত্যাদি। অর্থাৎ কোনো একটা জিনিসের বদলে অন্য কিছু যা প্রায় একই রকম কাজ দেয় কম বা বেশী। যেমন বিজেপিতে মোদির বিকল্প আদবানী। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের বিকল্প কংগ্রেস সরকার। বামফ্রন্টের বিকল্প তৃণমূল। বিকল্প, কারণ দুটোই একই শ্রেণি অর্থাৎ শোষকশ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে। কিন্তু মার্কসবাদী বা কমিউনিস্টরা বিকল্পের জন্য লড়ে না। তারা বর্তমান সমাজব্যবস্থার বিকল্প চায় না বরং এই সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়তে চায়। শ্রমিক শ্রেণির একনায়কত্ব পুঁজিপতির একনায়কত্বের বিকল্প নয় বরং এ গড়ে ওঠে পুঁজিপতির একনায়কত্বকে উচ্ছেদ করেই। মার্কস বলেছিলেন যে প্যারি কমিউন প্রমাণ করেছে যে তৈরী রাষ্ট্রযন্ত্রটা দখল করে শ্রমিকশ্রেণি তার নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারে না, প্রয়োজন হল এই রাষ্ট্রযন্ত্রকে চূর্ণ করার। কাজেই আসে সশস্ত্র বিপ্লবের ধারনা— পার্লামেন্টারী বিকল্প নয়। বিপ্লবী আন্দোলন

সম্পর্কেও র‍্যাডিক্যালের বক্তব্য গোলমেলে। ভারসাম্য ছাপিয়ে যাওয়ার অর্থ কি? বিপ্লবী আন্দোলনের দিশা বলতে মাও সে তুং এর নাম করে বলা হয়েছে 'দশের বিরুদ্ধে এক', মাও সে তুং বিপ্লব সম্পর্ক কোথায় এরকম কথা বলেছেন? মাও সে তুং এর বিপরীতে বরাবর গণলাইনের কথা বলেছেন। বিপ্লবী সংগ্রামের ক্ষেত্রে 'দশের বিরুদ্ধে এক' এটা সন্ত্রাসবাদীদের কথা মার্কসবাদীদের নয়। বিপ্লবী আন্দোলন প্রসঙ্গে মাও সে তুং এর কথাই যখন এল র‍্যাডিক্যাল যুবরা ভালো করতেন যদি হুনান আন্দোলন প্রসঙ্গে মাও সে তুং এর সেই বহুল প্রচলিত উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করতেন" বিপ্লব হচ্ছে একটি অভ্যুত্থান, এক হিংসাত্মক কার্যকলাপ, যার দ্বারা এক শ্রেণি অন্য শ্রেণিকে (ক্ষমতা থেকে) উচ্ছেদ করে।" র‍্যাডিক্যালরা বলেছেন মতাদর্শ হবে 'ভারসাম্যকে ছাপিয়ে যাওয়ার মতাদর্শ'— এটা কেমন কথা? 'ভারসাম্যকে ছাপিয়ে যাওয়া'— এটা মতাদর্শ হয় কিভাবে? মতাদর্শ 'মার্কর্সবাদ' বা 'মার্কর্সবাদ-লেলিনবাদ-মাও সে তুং চিন্তাধারা' বা 'গান্ধীবাদ' এসব বললে তা বোঝা যায়। মতাদর্শ হচ্ছে একটি সার্বিক চিন্তাধারা বা তত্ত্ব যা অনুশীলনের পথ দেখায়। 'ভারসাম্য ছাপিয়ে যাওয়া' এটা কিছু কর্মকৌশলের কথা হতে পারে কিন্তু যদি এটা মতাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হয় তবে তা হতে পারে নৈরাজ্যবাদী বা anarchist দের মতাদর্শ অর্থাৎ কোনো বাঁধন বা নিয়ম নয়— সব কিছু ভেঙে এগিয়ে চলো। কিছু ক্ষেত্রে র‍্যাডিক্যালদের ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গী মাত্রা ছাড়িয়েছে, বিষয়গুলো লঘু করেছে যেমন কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের বিভক্তি বা ভাঙনকে ভূতের নাচের সঙ্গে তুলনা করা ইত্যাদি। এরকম আর সবকিছুতে না গিয়ে আরেকটি বিষয়ে বলি— যদিও সরাসরি লালগড়ের নামটি নেই কিন্তু ভাব থেকে সম্ভবত এরকমই বোঝাচ্ছে যা র‍্যাডিক্যালরা বলছেন যে 'লালগড় আন্দোলন আড়ে বহরে গোপীবল্লভপুরের চেয়ে অনেক বড়। তার অভিঘাত অনেক গভীর।' হঠাৎ করে অপ্রাসংগিক ভাবে এই তুলনাটা কেন এল বোঝা গেল না। কি তার প্রয়োজন ছিল? ঐতিহাসিক এক মহান আন্দোলনকে অন্য মহান আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা টানার কোনো দরকার নেই। এটা কোনো কোনো আন্দোলনকে খাটো করা হয়। দু এক কথায় এর হিসাবও হয় না। প্রতিটি মহান আন্দোলনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ভূমিকা থাকে। গোপীবল্লভপুর আন্দোলন শুধু গোপীবল্লভপুর থানা এলাকার আন্দোলন নয়। প্রায় একই সাথে একই আন্দোলনের অংশ হিসাবে গোপীবল্লভপুর - ডেবরা - বহড়াগোড়া জুড়ে আন্দোলন গড়ে ওঠে তার মধ্যে গোপীবল্লভপুর ও ডেবরা হল মেদিনীপুর জেলার ও বহড়াগোড়া হল তৎকালিন বিহারের সিংভূম জেলার (বর্তমান ঝাড়খণ্ড) অধীন। অচিরেই এই সংগ্রাম বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার এক ব্যাপক এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। কাজেই আড়ে বহরের হিসাব করতে গেলে একটু খুঁটিয়ে করতে হবে। অভিঘাতের কথা যদি বলা হয় তবে তখনকার বিশেষ পরিস্থিতি না জানলে ও বুঝলে কিছুই বোঝা যাবে না। ঐতিহাসিকভাবে গোপীবল্লভপুর-ডেবরা-বহড়াগোড়া আন্দোলনের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। নকশালবাড়ি অভ্যুত্থানের পর গোটা ভারতবর্ষে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। পশ্চিমবঙ্গেও নকশালবাড়ি আন্দোলন তথা লাইনের সর্মথনে জনগণ বিশেষত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাট নাড়াচাড়া পড়ে। শুরুতে নকশালবাড়ি আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল সিপিআই (এম) পার্টির মধ্যে থাকা কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের নেতৃত্বে। সিপিআই (এম) এর সঙ্গে বিচ্ছেদ, কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সারা ভারত কোঅর্ডিনেশন কমিটি গঠন ও পরবর্তীতে সিপিআই (এম-এল) পার্টি গঠনের পর এই পার্টির নেতৃত্বে নতুন কোন অভ্যুত্থান গড়ে উঠবে কিনা তার জন্য মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। যদিও নকশালবাড়ির রাজনীতির প্রচার চলছিল কিন্তু একটা অনিশ্চয়তার বাতাবরণ বিরাজ করছিল। কমরেড চারু মজুমদার ডাক দিয়েছিলেন ছাত্র যুবদের গ্রামে গিয়ে কৃষিবিপ্লব গড়ে তোলার। বিশেষত প্রেসিডেন্সী কনসলিডেশনের ছেলেরা সেই ডাকে সাড়া দিয়ে সংগঠিতভাবে দলে দলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী এলাকায় মানুষের মাঝে ঢুকে পড়েন নতুন অভ্যুত্থান গড়ে তোলার সংকল্প নিয়ে, অনেক কষ্ট সহ্য করে। তারা সবাই টিকে থাকতেও পারেন নি। এর মধ্যে ডেবরা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির পুরনো কাজের এলাকা যেখানে কিছু প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব নকশালবাড়ি রাজনীতির পক্ষে দাঁড়ান - তারা সাদরে এই ছাত্র যুবদের গ্রহণ করেন। বহড়াগোড়াতেও তুলনামূলকভাবে কম হলেও কিছু পুরোনো কাজ ছিল ও নেতৃত্ব ছিল, সেখানেও ছাত্ররা কাজ শুরু করেন। ছাত্রদের কাজের অন্য এলাকা গোপীবল্লভপুর এলাকা ছিল একদম আনকোরা এলাকা যেখানে কমিউনিস্ট পার্টির কোনো পুরোনো কাজ বা প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বকে আন্দোলন গঠনে পাওয়া যায় নি - অবশ্য তলার স্তরের কিছু প্রগতিশীল মানুষ ও ব্যক্তিত্ব এই আন্দোলন গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

করেছেন। ছাত্রযুবদের কষ্টসাধ্য কাজ, কমিউনিস্ট পার্টির পুরোনো কাজ, প্রতিষ্ঠিত নেতাদের ভূমিকা, বাইরের পার্টির সাহায্য, চরম বিপ্লবী পরিস্থিতি, শোষণ নির্যাতন, মানুষের চরম দারিদ্র্য, খাদ্য সংকট, ব্যাপক বিপ্লবী রাজনীতির প্রচার তথা কাজ ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে ১৯৬৯ এর সেপ্টেম্বরে ঘটল গোপীবল্লভপুর-ডেবরা-বহড়াগোড়ার ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান-নকশালবাড়ির পর পশ্চিমবঙ্গে প্রথম অভ্যুত্থান, যার স্ফূলিঙ্গ সরাসরি মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায়, পার্শ্ববর্তী বাঁকুড়া জেলা, তৎকালীন বিহারের সিংভূম জেলা ও উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনা পশ্চিম বাংলার জনগণ বিশেষত ছাত্র যুব সমাজের মধ্যে সীমাহীন উল্লাসের সৃষ্টি করে ও সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দলে দলে ছাত্রযুবরা সর্বস্ব ত্যাগ করে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েন নতুন নতুন অভ্যুত্থান গড়ে তোলার শপথ নিয়ে। কিছুটা হলেও গোটা বাংলায় এই ছিল গোপীবল্লভপুর-ডেবরা-বহড়াগোড়া আন্দোলনের অভিঘাত। র‍্যাডিক্যালের কাছে অনুরোধ, তুলনা টানার আগে সমস্ত দিকগুলো ভালোভাবে জানুন। অযথা তুলনা টেনে কোনো আন্দোলনকে খাটো করবেন না। তবে র‍্যাডিক্যালের প্রচারপত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে যা বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে এবং এক কথায় খারিজ করে দেওয়াটা ঠিক নয়। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য লালগড়ে শোষণমূলক গ্রামীণ অর্থনীতিকে আঘাত না করার বিষয়টি এবং রাজনৈতিক বন্দী মুক্তির প্রশ্নে রিভিউ কমিটি সম্পর্কে সমালোচনামূলক মন্তব্য। র‍্যাডিক্যালের এই সমস্ত বক্তব্য তার সারবত্তা দিয়ে বিচার না করে যদি ব্যক্তিগুলি সম্পর্কে নকারাত্মক কোন ধারনার ভিত্তিতে করা হয় এরকম ভাবা হয় .... র‍্যাডিক্যাল!.... ওরা তো সংশোধনবাদের পথের পথিক, ... 'নতুন মন্ত্রে মোক্ষলাভ' ... 'শহরের নিরাপদ দূরত্বে বসে আন্দোলনের খুঁত ধরা' ... এভাবে দেখা হয় তবে তা ঠিক নয়। রাজনৈতিক বিতর্কে একটি অনভিপ্রেত বিষয় হল বক্তব্য বা বিষয়বস্তুকে গুরুত্ব না দিয়ে বক্তার উপর কথায় কথায় ছাপ মেরে দেওয়া বা স্ট্যাম্পিং করা। সৌভিকের লেখায় তার কিছু রেশ আছে। মতাদর্শগত বা রাজনৈতিক সংগ্রাম অবশ্যই চালানো উচিত, কিন্তু খোলা মনে। কমরেড মাও সে তুং বলেছেন 'মুক্তমনা হোন'। তিনি বলেছেন 'বক্তাকে দোষ দেবেন না, তার কথাকে সতর্কবাণী হিসাবে গ্রহণ করুন', কিন্তু প্রায়শই এর লংঘন হয়।

'বাম' বিচ্যুতির প্রাধান্যের সময় বিপ্লবীদের মধ্যে একটা কথা খুব চালু ছিল, 'কি বলছে সেটা বড় কথা নয়, কে বলছে সেটাই বড় কথা'। এভাবে কিছু কিছু কমরেডকে 'মধ্যপন্থী' 'সংশোধনবাদ' ইত্যাদি ছাপ দিয়ে তার সব বক্তব্যকেই খারিজ করা হত। এটা কমরেড মাও সে তুং য়ের শিক্ষা নয়। মাও সে তুং বলেছিলেন ভালো পরামর্শ যে কেউ দিলে তা গ্রহণ করা উচিত। তিনি উল্লেখ করেছিলেন পার্টি বহির্ভূত মিঃ লি তিং মিনের কথা যার ভালো পরামর্শ ''দক্ষ সৈনিক, সহজ প্রশাসন'' চীনা পার্টি গ্রহণ করেছিলেন। কমরেড সত্যনারায়ণ সিংয়ের 'সংশোধনবাদের' কথা চোখ বুঁজে খুব জোরে সোরে বলাটা কারো কারো ক্ষেত্রে রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে। সৌভিকও তার ব্যতিক্রম নন। কি অপরাধ করেছিলেন সিপিআই (এম.এল.) এর তৎকালিন পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড সত্যনারায়ণ সিং। ১৯৭০ এর দশকে সিপিআই (এম.এল.) যখন নতুন যুগের নামে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সেতুং চিন্তাধারার সাধারণ শিক্ষা তথা নকশালবাড়ি গণঅভ্যুত্থানের শিক্ষা ভুলে গিয়ে বিপ্লবী গণলাইন তথা জনযুদ্ধের লাইনের বিপরীতে ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদের কবলে অধঃপতিত হওয়ার বিপদের মুখে দাঁড়িয়েছিল তখন জমিদারদের সঙ্গে একইভাবে ধনী-কৃষকদের আঘাতের লক্ষ্যবস্তু না করে মাও সে তুং এর শিক্ষা অনুযায়ী আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা উপনিবেশিক ভারতে জমিদার ও ধনীকৃষকদের মধ্যে পৃথকীকরণের লাইন, সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ চালিয়ে গান্ধী, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যক্তির স্থাপিত মূর্তিগুলো না ভাঙা, স্কুল কলেজ, লাইব্রেরী ইত্যাদি না পোড়ানো, গ্রাম শহরে সমানভাবে আক্রমণাত্মক লাইন না চালানো, আক্রমণ ও আত্মরক্ষার মধ্যে পার্থক্য করা, দ্রুত বিজয়ের লাইন নয় ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলা, ব্যক্তি কর্তৃত্ববাদ নয় সংগঠনে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা চালু করা, গণ সংগঠন গণআন্দোলন বর্জন নয় বিপ্লবী গণলাইন গ্রহণ করা, সশস্ত্র সংগ্রামকে প্রধান হিসাবে রেখে সশস্ত্র সংগ্রামের সঙ্গে অন্যান্য ধরনের সংগ্রাম যুক্ত করা, পার্টিতে মত বিরোধীদের প্রতি খতমের লাইন না নেওয়া, আমেরিকা দ্বারা কম্বোডিয়া আক্রমণকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হিসাবে না দেখা ও মাও সে তুং - এর ১৯৭০ সালের ২০ শে মে এর বিবৃতি অনুযায়ী বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা ও বিপদ সম্পর্কে সতর্ক থেকে জনগণের শক্তির উপর আস্থা রাখা— এই সমস্ত কথাগুলি কমরেড সত্যনারায়ণ সিং বলেছিলেন। তার জন্য তাকে 'সংশোধনবাদী', 'ক্রুশ্চেভ

সংশোধনবাদের শংকর জাত কুত্তা' (Curs and dog of Khruschev revisionism) ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। স্মরণ করা দরকার যে, কমরেড সত্যনারায়ণ সিং তখনও পর্যন্ত 'শ্রেণিশত্রু খতম গেরিলা যুদ্ধের সূচনা' এই লাইনের বিরোধিতা করেন নি বা নির্বাচন বয়কটের লাইন ত্যাগ করেন নি। ব্যক্তি শ্রেণিশত্রু খতমের লাইন যে আসলে ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদী লাইন— এই উপলব্ধিতে তিনি পৌঁছান কমঃ চারু মজুমদারের সঙ্গে তার ১৯৭১ সালের ৭ই নভেম্বর সাংগঠনিক বিচ্ছেদেরও বেশ কিছুদিন পরে ১৯৭২ সালের গোড়ায়। ততদিনে ১৯৭০-৭১ সালেই সত্যনারায়ণ সিং চিহ্নিত হয়ে গেছেন 'সংশোদনবাদী' হিসাবে যা আজও চলছে। আর নির্বাচন যে একটি রণনৈতিক লাইন নয় রণকৌশলগত লাইন - কাজেই নির্বাচনকে স্থায়ী ভাবে বয়কট না করে কখনও কখনও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা উচিত, এই উপলব্ধিতে কমঃ সত্যনারায়ণ সিং পৌঁছান অনেক পরে জরুরী অবস্থার পর, ১৯৭৭ এ ইন্দিরা গান্ধী সরকারের পরাজয়ের পর। আজ 'কমরেড সত্যনারায়ণ সিং প্রয়াত হওয়ার এত বছর পরও কি আমরা এই উপলব্ধিতে পৌঁছাবো না যে আজকে যা মনে হয় সহজ, সেসময় 'বাম' বিচ্যুতির প্রাধান্যের জোয়ারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সংশোধনবাদের তকমা লাভ থেকে ভয় না পেয়ে কমরেড় সত্যনারায়ণ সিং যে ভূমিকা পালন করেছিলেন 'বাম' বিচ্যুতির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করেছিলেন এবং এভাবে বিপ্লবী রাজনীতি ও সংগঠনকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন সেটা ছিল তার এক ঐতিহাসিক ভূমিকা যার জন্য উপযুক্ত সম্মান তার প্রাপ্য। কমঃ সত্যনারায়ণ সিং - য়ের সমস্ত ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও এই সামান্য স্বীকৃতিটুকু কি আমরা দিতে পারি না? দশচক্রের সঙ্গে সুর না মিলিয়ে আমরা সংস্কার মুক্ত খোলামনে কি একটু ভাবতে পারি না?

লালগড় নিয়ে 'মাওবাদী'দের আত্মসমালোচনা নিয়ে মত দেওয়ার আগে আর একটি বিষয়ে কিছু বলি। রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির ব্যাপারে রিভিউ কমিটির বিষয়। র‍্যাডিক্যাল ও রিভলিউশনারী উদ্যোগের বিতর্কের একটি বিষয় এটিও। বিতর্ক এতদূর যে এখানে নিউ ডেমোক্রেসিকেও (ND) টেনে এনেছেন রিভলিউশনারী উদ্যোগের সৌভিক এভাবে যে, ''রিভিউ কমিটি বয়কটপন্থীরা হলেন বিপ্লবী (তাহলে তো সিপিআই (এম.এল.) (এন ডি) - কেও বিপ্লবী বলতে হয়)!" একথা সুবিদিত যে নিউ ডেমোক্রেসি রিভিউ কমিটি নিয়ে লাগাতার বিতর্ক চালিয়েছে। মানবাধিকার আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট সংগঠক ''ভিন্ন মতের অধিকার" শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন 'এক আক্রান্ত কর্মীর আখ্যান" হিসাবে উল্লেখ করে মে ২০১২ তে। এই পুস্তিকায় রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি ও রিভিউ কমিটি সম্পর্কে এবং জঙ্গলমহল ও সাতদফা চুক্তি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অবস্থানকে তিনি ন্যায্যতা দিয়েছেন ও নিউ ডেমোক্রেসি সহ সমালোচকদের খোঁচা দিয়েছেন। এর জবাবে বিপ্লবী গণলাইন প্রকাশনার পক্ষ থেকে ''ভিন্নমতের অধিকার ও আমাদের জবাব' - এই শিরোনামে একটি লেখা বের করা হয়। যাতে নিউ ডেমোক্রেসির পক্ষ থেকে উক্ত পত্রিকায় লিখিত বক্তব্যগুলি খণ্ডন করা হয়। এই পুস্তিকায় রিভিউ কমিটির বিষয়ে নিউ ডেমোক্রেসির আপত্তিগুলি তুলে ধরা হয়েছে। এখন রিভিউ কমিটি নিয়ে র‍্যাডিক্যাল ও সৌভিকদের বিতর্কটি সামনে এসেছে। র‍্যাডিক্যালের বক্তব্যের ভঙ্গীতে অনেক তীক্ষ্ণতা আছে। বাচনভঙ্গীর বিতর্কে আমরা ঢুকতে চাইছি না তার বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তুকেই আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। র‍্যাডিক্যাল ও রিভলিউশনারী উদ্যোগ দুপক্ষেই প্রায় একমত যে রিভিউ কমিটি একটি ফাঁদ— রিভলিউশনারী উদ্যোগ বলেছেন 'ভুলভুলাইয়া'। প্রশ্নটি ছিল এই ধরনের এক কমিটিতে যোগ দেওয়া না দেওয়ার প্রশ্ন ও বন্দী মুক্তি আন্দোলনের কর্তব্য। রিভলিউশনারী উদ্যোগের মতে 'ভুলভুলাইয়া' হলেও যেহেতু জনগণের মধ্যে মোহ ছিল যে রিভিউ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বন্দীমুক্তি ঘটবে, কাজেই বাইরের বন্দীমুক্তি সংগ্রামের পাশাপাশি রিভিউ কমিটির মধ্যে থেকে সংগ্রাম করা উচিত ছিল। ফলে যারা 'বাম' বিচ্যুতির শিকার হয়ে রিভিউ কমিটি 'বয়কটে'র কথা বলেছিলেন ও রিভিউ কমিটিতে যুক্ত মানবাধিকার নেতাদের বিরোধিতা করেছিলেন তারা আসলে আক্রমণের বর্শামুখ ঐ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দিয়ে প্রকৃত শত্রুকে আড়ালে যেতে সহায়তা করলেন, বন্দীমুক্তি আন্দোলনকে বিভাজিত করলেন, না হলে বন্দীমুক্তি আন্দোলন অন্য চেহারা নিত— এটাই হচ্ছে মোদ্দা কথায় রিভলিউশনারী উদ্যোগের মত। র‍্যাডিক্যাল সরাসরি বয়কটের কথা লেখেননি সামগ্রিক ভাবেই রিভিউ কমিটি ও তার অংশগ্রহণকারীদের এতে যোগদানের বিরোধিতা করেছেন। 'বাম' বিচ্যুতি, দক্ষিণ বিচ্যুতি, জনগণের মোহ, ভেতর থেকে লড়াই ইত্যাদি বিষয়গুলো যখন এসেছে তখন দু-একটা কথা পরিষ্কার করা দরকার। রিভিউ কমিটি কোন গণসংগঠন ছিল না বা তাতে জনগণের অংশগ্রহণের প্রশ্ন ছিল না। এটা ছিল একটি সরকারী

কমিটি যারা বন্দীমুক্তির ব্যাপারে সরকারের কাছে সুপারিশ করবে— সিদ্ধান্ত নেবে মমতা সরকার। জনগণের মোহ ও সেই অনুযায়ী কাজ করতে গেলে তো অনেক কিছুই করতে হয়। এভাবে চললে কেউ মমতাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চাইবেন, কেউ নির্বাচনে TMC কে সমর্থন করবেন, কেউ মমতা মন্ত্রীসভায় যোগ দেবেন— সবই জনতার ইচ্ছার নামে। রিভিউ কমিটি সরকার কি জন্য করেছিলেন— তা কি রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি করতে না তাদের মুক্তি আটকাতে? আমাদের আপত্তির জায়গা এটা নয় যে বন্দীমুক্তির ব্যাপারে রিভিউ কমিটি গড়া হয়েছিল। আমাদের আপত্তির জায়গা যে কাজের উদ্দেশ্যে রিভিউ কমিটি গড়া হয়েছিল তা নিয়ে। ২০১১ সালে ৪ জুন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হল

"বিচার অসমাপ্ত থাকার কারণে দীর্ঘদিন ধরে কিছু সংখ্যক বিচারাধীন রাজনৈতিক বন্দী সংশোধনাগারে আছেন..."

"উপরে উল্লিখিত মামলাগুলির রিভিউ প্রয়োজনীয়।"

"রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত অপরাধের (Offences) জন্য যে সব ব্যক্তিরা সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন তাদের কেসগুলির রিভিউ দরকার।" "রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং অথবা সাজানো এফআইআর - এর ভিত্তিতে মামলাগুলির রিভিউ দরকার"

এই বিজ্ঞপ্তিতে এরপর বলা হল ঃ

"রাজ্য স্তরীয় রিভিউ কমিটি নিম্নলিখিত কার্যাবলী নিষ্পন্ন করবে—

১) রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এফআইআর-গুলিকে চিহ্নিত করা।

২) রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত অপরাধের (Offences) কারণে যে সব বিচারাধীন রাজনৈতিক বন্দীরা বিচারের প্রক্রিয়ায় আছেন, তাদের চিহ্নিত করা।

৩) অপরাধের প্রকৃতি/বৈশিষ্ট্য এবং এধরনের অপরাধ সংঘটিত হওয়ার প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করা।

৪) সংশোধনাগারে বন্দীদের আচরণ পরীক্ষা করা।

৫) অপরাধ সংঘটিত করতে তাদের ফিরে যাওয়ার সম্ভাব্যতা নিরূপণ করা।

৬) অন্যদের অপরাধ করতে ইন্ধন যোগাবে কিনা তার সম্ভাব্যতা নিরূপণ করা।

এই কাজগুলো রিভিউ কমিটিকে করতে হবে। এসব কাজগুলো বিশেষ করে শেষের তিনটি কি খুব সম্মানজনক কাজ? এতো রাজবন্দীদের অপরাধী হিসাবে দেখা। এই কাজগুলো করার জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাড়াহুড়ো করে এই কমিটিতে ঢুকে গেলেন। একটা প্রকাশ্য প্রতিবাদ করলেন না বা সরকারকে বললেন না যে আমরা তবেই ঢুকবো— আগে এই অসম্মানজনক শর্তগুলো সরান। কমপক্ষে প্রেসের সামনে এই বক্তব্য তো রাখতে পারতেন যে রিভিউ কমিটির কাজ হবে শুধুমাত্র অন্যান্য বন্দীদের থেকে রাজবন্দীদের পৃথক করে তার লিস্ট তৈরী করা। বন্দীরা কোন পরিস্থিতিতে অপরাধ করেছেন বা কি ধরনের অপরাধ করেছেন, জেলে কি করেছেন, বাইরে গিয়ে আবার 'অপরাধ' অর্থাৎ মমতা সরকার বিরোধী 'জঙ্গী' রাজনৈতিক আন্দোলন করবেন কিনা বা অন্য লোকজনদের মমতা সরকার বিরোধী জঙ্গী কার্যক্রমে জড়ো করবেন কিনা, এগুলো দেখা রিভিউ কমিটির কাজ হতে পারে না। জেলে যাই আচরণ হোক, তার জন্য একজন বন্দী কি ছাড়া পাবেন না? আর জেলে আচরণের রিপোর্ট কে দেবে - না জেলর। যারা জেলে জেলে কর্ত্তৃপক্ষের দালালী করবেন বা জেলের মধ্যেকার অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেন না তাদের জন্য জেলে জোটে বিশেষ রেমিশন (সাজার মেয়াদে ছাড়)। আর যারা কর্ত্তৃপক্ষের অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেন তাদের রেমিশন কাটা যাবে আর জুটবে লাল কালি অর্থাৎ মন্দ ব্যবহারের সার্টিফিকেট। কোন লোক বাইরে বেরিয়ে অপরাধ করতে পারে তার জন্য কখন একটা লোককে আটকানো যায় না UAPA ধরনের কালাকানুনের মাধ্যমে। কাজেই মমতা ব্যানার্জী অঘোষিত UAPA লাগু করলেন 'অপরাধ প্রবণ' রাজবন্দীদের ক্ষেত্রে। কাজেই রিভিউ কমিটির কাজ হবে সেই রাজনৈতিক বন্দীদের লিস্ট তৈরী করা ও তাদের মুক্তির সুপারিশ করা, যারা জেলে কর্তৃপক্ষের অন্যায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন নি বা মমতা জিন্দাবাদ বলে দিন কাটিয়ে গেছেন, যারা বাইরে বেরিয়ে মমতা সরকারের বিরুদ্ধে কোন জঙ্গী কার্যকলাপ করবেন না, যারা বাইরে গিয়ে লোকজনকে মমতা সরকারের বিরুদ্ধে খেপাবেন না বা তাদের সংগঠিত করে কোন জঙ্গী কার্যকলাপ করবেন না। স্বাভাবিক ভাবেই কিছু ধান্দাবাজ, দলত্যাগী বা আত্মসমর্পণকারী ছাড়া এই ভিত্তিতে কেউই ছাড়া পাবেন না। প্রকৃত কোন বিপ্লবী এর আওতায় আসবেন না। এই ন্যক্কারজনক কাজ করার জন্য গঠিত

যে কমিটি, কোনো প্রগতিশীল মানুষের কি সেই কমিটিতে যাওয়া উচিত? কেউ বলতে পারেন এই শর্তগুলি না মেনে রিভিউ কমিটির লোক তো প্রকৃত রাজবন্দীর নাম সুপারিশ করতে পারেন। তারা সেরকম পারেন, কিন্তু সরকারী বিজ্ঞপ্তি তো রয়েই গেল। সরকার তো সেই হিসাবে সিদ্ধান্ত নেবে। এবং সরকার যে না বুঝে ঐ শর্তগুলি রেখেছে তা তো নয়, তারা সচেতন ভাবে ঐ শর্তগুলি রেখেছে যাতে প্রকৃত বিপ্লবীরা ছাড়া না পায়। এছাড়া সম্ভবত সরকার বন্দী মুক্তি আন্দোলনের গভীরতা ও বিপ্লবীদের মানসিকতা মাপতে চাইছিলেন ইচ্ছে করে আপত্তিকর শর্তগুলো রেখে। যখন দেখলেন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের থেকে সেরকম তীব্র প্রতিক্রিয়া নেই, নেমন্তন্নের নাম শুনে বাছবিছার না করে পাত পেতে বসে আছে— সরকার বুঝলেন এবার এদের ইচ্ছামত নাচানো যেতে পারে। সেটাই ঘটল যখন মানবাধিকার নেতারা জঙ্গলমহল অস্ত্র মুক্ত করার সরকারী কর্মসূচী মেনে ৭ দফা চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। কিষেণজি সহ বিভিন্ন বিপ্লবী নেতাদের মেরে দেওয়া, যৌথবাহিনী প্রত্যাহার না করা, রাজবন্দীদের না ছাড়া— এখনো কি মমতা সরকারের চালাকি ও প্রকৃত চরিত্র বোঝাতে হবে? রিভিউ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কোন মাওবাদী বন্দী কি ছাড়া পেয়েছেন? জামিন মানে বিনাশর্তে মুক্তি নয় এটা নিশ্চয়ই কাউকে বোঝাতে হবে না। আসলে মমতার চালাকি ছিল রিভিউ কমিটি তৈরী করে রাজবন্দীর মুক্তির-বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়া— এভাবে কালক্ষেপ করে নিজের সংগঠন ও সরকারকে গুছিয়ে নেওয়া, আন্দোলনের মাঝে বিভক্তি ঘটিয়ে, পারলে কিছু লোককে কিনে নেওয়া যেমনটা গোর্খাল্যান্ডের ক্ষেত্রে ঘটেছে ও লালগড়ের আন্দোলন সহ বিপ্লবী আন্দোলন শেষ করে দেওয়া। আমাদের দুঃখ অনেক লোকে মমতার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও চরিত্র সময়মত বুঝলেন না ও তারা যে মোহগ্রস্ত হয়ে গেছিলেন তা স্বীকার না করে জনগণের মোহ, ধাপে ধাপে মুখোশ উদ্ঘাটন ইত্যাদি নানা কথা বলছেন। রিভলিউশনারী উদ্যোগ রিভিউ কমিটির মধ্যে ঢোকাকে ন্যায্যতা দিয়েছেন। রিভিউ কমিটির আপত্তিকর শর্তগুলি আমরা উল্লেখ করেছি। এই আপত্তিকর ধারাগুলোর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলনে না গিয়ে রিভিউ কমিটির ভেতরে ঢুকে 'সংগ্রাম' কি বন্দীমুক্তির ক্ষেত্রে সাহায্য করল? কি এমন বাধ্যবাধকতা ছিল যে, যেখানে ভাবতে হতো আর কোনো উপায় নেই, যেন তেন প্রকারেণ কিছু রাজবন্দীকে রিভিউ কমিটির মাধ্যমে মুক্ত করতেই হবে। অতীতের অভিজ্ঞতাও কি আমাদের সাহায্য করলো না? ১৯৭৭-এ জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যখন জনতা সরকার ক্ষমতায় আসে যার অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর বন্দীমুক্তির ব্যাপারে তারা নানা টালবাহানা শুরু করে, পাঁচ বছর জেলে থাকলে তবে মুক্তি, হিংসা ত্যাগ করলে তবেই মুক্তি ইত্যাদি নানান কথা বলতে থাকে। কিন্তু রাজবন্দীদের প্রতি সহানুভূতির হাওয়া ও বন্দী মুক্তি আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত প্রায় সব রাজবন্দীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এবার পশ্চিমবঙ্গে সে তুলনায় এমন কি খারাপ পরিস্থিতি ছিল? সি পি এম সরকারের প্রতি মানুষের তীব্র ঘৃণা, লালগড় আন্দোলন সহ সিপিএম সরকারের বিরুদ্ধে যে সব সংগ্রামগুলো হয়েছিল তার প্রতি মানুষের ব্যাপক সমর্থন ছিল ও এই সব আন্দোলনের কারণে যারা আটক ছিলেন তাদের প্রতি মানুষের ব্যাপক সহানুভূতি ছিল। তখনও মমতা তার ভিতকে এতটা গুছিয়ে নিতে পারেন নি বা বিপ্লবী আন্দোলন বা গণতান্ত্রিক অধিকারের বিরুদ্ধে এতটা বেপরোয়া হতে পারেন নি। প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিদের একাংশকে নানাধরনের আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিয়ে এখন যেমন তৃণমূল কিনে নিয়েছে তখনো সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় নি। সে সময়ে রিভিউ কমিটির অবমাননাকর শর্ত বাতিলের দাবি ও বিনাশর্তে সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তির দাবি মানুষের ব্যাপক সমর্থন পেত ও মমতা সরকারকে এই দাবি মানতে বাধ্য করার যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল। গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব না দিয়ে অবমাননাকর শর্ত সম্বলিত রিভিউ কমিটির মধ্যে ঢুকে যাওয়ার ফলে রিভিউ কমিটি মান্যতা পেল, মানুষের মধ্যে অহেতুক মোহের সঞ্চার হল ও বন্দীমুক্তি আন্দোলন দুর্বল হল। রিভিউ কমিটির পরিণতি, রাজবন্দীর মুক্তি না ঘটা সত্ত্বেও এখনো যদি কেউ কেউ রিভিউ কমিটিতে যোগদানের ন্যায্যতা দেন যেমনটি রিভলিউশনারী উদ্যোগের যুবরা দিয়েছেন তার থেকে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে? যারা 'ভুলভুলাইয়া' বা গোলকধাঁধায় ঢোকার ব্যাপারে আপত্তি করলেন তাদেরকেই যদি অভিযুক্ত করা হয় তাহলে ভাবতে হয় কোন দেশে আমরা আছি? যদি এমনটাই ভাবা হয় যারা রিভিউ কমিটির প্রশ্নে সমালোচনা করলেন তারাই আসলে বন্দীমুক্তি আন্দোলনে ভাঙন আনলেন বা বন্দীমুক্তি আন্দোলনকে দুর্বল করলেন তবে তা হল বিষয়টিকে উল্টো করে দাঁড় করানো, পায়ের উপর দাঁড়িয়ে না হেঁটে মাথার উপর দাঁড়িয়ে উল্টোমুখে

হাঁটা। তাহলে বলব কেউ কেউ আছেন যারা বাস্তব থেকে শেখেন না, কিছু বাঁধাধরা বিশ্বাস, কিছু মানুষের বা সংগঠনের উপর অন্ধভক্তি তাদের রাস্তা দেখায়। সৌভিক বলেছেন রিভিউ কমিটির বয়কট যদি সঠিক হয় তবে তো নিউ ডেমোক্রেসিকেও বিপ্লবী বলতে হয় (কী বিড়ম্বনা!)। তিনি বিষয়টা ঠিকভাবে রাখেন নি। বিতর্কটি রিভিউ কমিটি বয়কট কি অংশগ্রহণ এরকম ভাবে ছিল না—বিতর্কটি ছিল রিভিউ কমিটিতে ঢুকবো কি ঢুকবো না সে প্রশ্ন পরে— কথা হোল রিভিউ কমিটির এই অবমাননাকর শর্ত বাতিলের দাবিতে সংগ্রাম করবো কি করবো না। কথাটি এরকম ছিল না এই অবমাননাকর শর্ত খারিজ হলেও নীতিগত ভাবেই রিভিউ কমিটি বয়কট করা হবে। কাজেই রিভিউ কমিটি বয়কট অথবা অংশগ্রহণ এভাবে পেশ করা বিতর্কটির অতি সরলীকরণ। আর নিউ ডেমোক্রেসিকে অবিপ্লবী বলার কারণটা কি? বলা যেতে পারে নিউ ডেমোক্রেসির অপরাধ হল তারা কমঃ চারু মজুমদারের সংশোধনবাদ বিরোধী ভূমিকার পাশাপাশি কমঃ সত্যনারায়ণ সিং এর 'বাম' বিচ্যুতি বিরোধী সংগ্রামের মান্যতা দেয়। আর একটি অপরাধ হল তারা চন্দ্রপোল্লা রেড্ডীর 'প্রতিরোধ সংগ্রামের মাধ্যমে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলার তত্ত্ব' সমর্থন করে। এখন সমস্যা যেটা হচ্ছে যে ভারতে বর্ণ ব্যবস্থা এত বেশী প্রবল যে এর ছোঁয়াচ রাজনীতিতেও আছে। যতই বলি জাতপাত মানি না কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে মনুসংহিতার অনুসরণ চলে। যে অপরাধ করলে শূদ্রের মৃত্যুদণ্ড সেই একই অপরাধের জন্য ব্রাহ্মনের শাস্তি হবে মাত্র বারো পন অর্থদন্ড। যারা মমতাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন, তার জনসভায় লোক ভরিয়েছিলেন (নিজেদের স্বীকৃতি অনুযায়ী) যাদের জন্য মানবাধিকার আন্দোলনের কিছু অন্যতম ব্যাক্তিত্বরা রিভিউ কমিটির কলঙ্ক গায়ে মাখলেন, শত অপরাধ সত্ত্বেও তারা হলেন বিপ্লবী (ব্রাহ্মন) আর যারা মমতা হাওয়ায় ভেসে গেলেন না, সিপিএম বিরোধিতা অটুট রেখেও মমতাকে নির্বাচনে সমর্থন করলেন না, রিভিউ কমিটি ও জঙ্গলমহল নিয়ে অমর্যাদাকর কুৎসিৎ চুক্তিকে সমর্থন করলেন না তারা হলেন অবিপ্লবী (শুদ্র)। আশাকরি এই রাজনৈতিক মনুবাদের একদিন অবসান হবে।

সবশেষে আমরা 'মাওবাদীদের' আত্মসমালোচনা বিশেষত লালগড় সম্পর্কিত আত্ম-সমালোচনা বিষয়টিতে আসব। এটা ভালো যে কিছু কিছু বিষয় বিশেষত লালগড় সম্পর্কিত বিষয়ে 'মাওবাদীরা' আত্ম অনুসন্ধান করছেন ও মূল্যায়নের রাস্তায় হাঁটছেন। আমরা আশা করব একটি সার্বিক মূল্যায়ন। উপরোক্ত প্রচারপত্রে তারা বিশ্লেষণ করে যে ভুলগুলির উল্লেখ করেছেন তা হল—

১) মমতা কোন শ্রেণির প্রতিনিধি এ ব্যাপারে যথেষ্ট স্পষ্টতা (Clarity) না থাকা। এর ফলে সিপিএম হারলে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার হবে এবং রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তি পাবে এবং তাতে আমাদের সুবিধা হবে এ ধরনের মনোভাব তৈরী হওয়া।

২) এই মনোভাবের ফলশ্রুতিতে যৌথ-কর্মসূচীর নামে মমতার মিটিং মিছিলে নিজেদের প্রভাবিত জনগণকে ব্যাপকভাবে পাঠানো। যে অবস্থাটায় নিজেদের সংকীর্ণ শ্রেণিস্বার্থের পরিপূর্ণ ফয়দা তোলে মমতা ব্যানার্জী ও তাঁর টি এম সির প্রতিক্রিয়াশীল নেতারা, ফলে ব্যবহার করার পরিবর্তে নিজেদেরই ব্যবহৃত হয়ে যেতে হলো।

৩) সরকারের সঙ্গে, তা কেন্দ্রের সরকারের সঙ্গে হোক বা রাজ্যের সরকারের সঙ্গেই হোক শান্তিবার্তা সম্পর্কে জারী কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদকের প্রকাশ্য বিবৃতি না মানলে শান্তি বার্তায় না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও পশ্চিমবঙ্গে মমতার 'শান্তি বার্তার' ভাঁওতা ও ফাঁদে পা দেওয়া।

৪) একটা সময় যখন জঙ্গল মহলে (আন্দোলন) তুঙ্গে ছিল তখন পরিস্থিতি অনুকূল থাকা সত্ত্বেও সঠিক সময়ে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে জনগণের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গ্রাম ও আঞ্চলিক স্তরের রূপ দিতে না পারা।

৫) দীর্ঘদিনের শোষণ বঞ্চনার ক্ষেত্রে লালগড় আন্দোলন ছিল এক বিদ্রোহ। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ব্যাপারে প্রকাশ্য ঘোষণা না করে লাশ গায়েবের ঘটনা ঘটানো যা সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী করতে অভ্যস্ত ছিল, সিপিএম ও তাদের হার্মাদ বাহিনীর কুকর্মের প্রতি অতি প্রতিক্রিয়া হিসাবে আমাদেরও একই ভুলের শিকার হওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি।"

মাওবাদীদের প্রচারপত্র থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়ার কারণ এই যে, যাতে কেউ না বলতে পারে যে আমরা সঠিকভাবে বিষয়টি

রাখি নি। পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কাছে মাওবাদীদের এই খোলা আত্ম-সমালোচনা এক ভাল দৃষ্টান্ত। ভুল করা সম্পর্কে লেনিন তার 'বামপন্থী কমিউনিজম, শিশু সুলভ বিশৃংখলা' নিবন্ধে বলেছেন, "তিনিই জ্ঞানী যিনি ভুল করেন না— এ কথাটা ঠিক নয়। এধরনের কোনো লোক নেই বা থাকতেও পারে না। তিনিই জ্ঞানী যিনি খুব মারাত্মক ভুল করেন না এবং যিনি জানেন যে কিভাবে সহজে ও দ্রুত তা সংশোধন করা যায়।" মাওবাদীদের এই পাঁচ পয়েন্ট আত্মসমালোচনা নিয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে এ বিষয়গুলির আরো গভীরে যাওয়া প্রয়োজন এবং গুরুতর অনেক ত্রুটি উল্লিখিত হয় নি।

আত্মসমালোচনার প্রথম বিষয় হচ্ছে মমতার শ্রেণি চরিত্র না বোঝা। এটা অবশ্যই গুরুতর ভুল যা লেনিনের ভাষায় জ্ঞানীদের করার কথা নয়। এবং ভুলটাও দ্রুত সংশোধিত হল না ও তার জন্য বড় ধরনের মাশুলও দিতে হল। মমতাকে কোন শ্রেণির প্রতিনিধি হিসাবে তারা ভেবেছিলেন তা জানার আগ্রহ রইল। আমাদের মতে গোটা আন্দোলনটার একটা দুর্বলতার দিক হল শ্রেণিসংগ্রাম ঠিকমত না বোঝা, শ্রেণি বিশ্লেষণ— কে শত্রু কে মিত্র তা সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণ না করা, পুলিশ ও সিপিএম বিরোধী সংগ্রামকেই শুধু বিপ্লবী লড়াই হিসাবে ভাবা, পার্টির সঙ্গে শ্রেণি ও ব্যক্তির সম্পর্ক ঠিকমত না বোঝা। শুধু যে এটা তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষেত্রে ঘটেছে তাই নয় এমনকী সিপিআই (এম) - এর ক্ষেত্রেও ঘটেছে। সিপিআই (এম) শাসক শ্রেণির পার্টি এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তাই বলে সিপিআই (এম) এর প্রতিটি সদস্যকে জোতদার হিসাবে দেখা, নেতৃত্ব ও সাধারণ সদস্যের মধ্যে পার্থ্যকীকরণ না করা এগুলো ঘটেছে, ফলে কোথাও কোথাও নির্বিচারে সিপিআই (এম) সদস্যদের উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। এই বিষয়টি উৎসাহিত হয়েছে কিষেণজির প্রচারিত এই তত্ত্ব দ্বারা যে পশ্চিমবঙ্গের কয়েক লক্ষ সিপিআই (এম) পার্টি সদস্যই হচ্ছে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের কয়েক লক্ষ জোতদার। এভাবে বললে সামন্তবাদ বিরোধী লড়াই বিপথচালিত হয়। হতে পারে কোনো কোনো সিপিআই (এম) সদস্য পুলিশের দালালী করেছে ও শাস্তিযোগ্য ছিল ও অপরাধ অনুযায়ী বিচার করে তার শাস্তি দেওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু তার জন্য এই তাত্ত্বিক বিকৃতির কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া এই তত্ত্ব অনুযায়ী কর্মকাণ্ড চালালে সাময়িক কিছু বাহবা (বিশেষত তৃণমূলের কাছ থেকে) মিললেও আন্দোলন বিপথচালিত হয়, অহেতুক শত্রু সংখ্যা বাড়ে ও আখেরে ক্ষতি হয়। মমতার শ্রেণি চরিত্র ঠিকমত না বোঝার ফলাফল কি হয়েছে সবাই দেখেছেন। কিভাবে রিভিউ কমিটি গড়ে মমতা বন্দীমুক্তির ব্যাপারে ধোঁকা দিলেন, কিভাবে জঙ্গলমহলে শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের নেতা সহ সবাইকে ধোঁকা দিয়ে দিয়ে যৌথবাহিনী বহাল রাখলেন, আন্দোলনের নেতোদের একের পর এক খুন, আটক বা দলত্যাগ ঘটিয়ে ও জঙ্গল মহলের যুবকদের চাকরী, সস্তা চাল বিলি ইত্যাদি করে 'শান্তি প্রতিষ্ঠা' করলেন এবং গর্ব করলেন যে তিনি (মমতা) দুটো জায়গাকে ঠান্ডা করেছেন জঙ্গলমহল ও গোর্খাল্যান্ড। মাও সে তুং বলেছেন "কখনো শ্রেণিসংগ্রামের কথা ভুলবেন না।" ভারতের 'মাওবাদীরা' মমতার ব্যাপারে মাও সে তুং এর এই শিক্ষা ভুলে গেলেন এটা বড় আপশোষের কথা। আর একটি কথা। তারা বলেন নির্বাচন বয়কটের কথা— কিন্তু মমতার পার্টিকে গোপনে তারা নির্বাচনে সমর্থন করলেন, মমতাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চাইলেন এ কেমন কথা? এটা যে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম ঘটলো তাই নয়। এর আগেও অন্ধ্রপ্রদেশে একদিকে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন অন্যদিকে তেলেগু দেশমকে হারানোর জন্য গোপনে কংগ্রেসের রাজশেখর রেড্ডীদের সমর্থন করলেন। এবং বয়কট কি রকম? না অন্য পার্টি গ্রামে ঢুকতে পারবে না, ঢুকলেই স্কোয়াডের সশস্ত্র আক্রমণ, শুধুমাত্র ছাড় রাজশেখর রেড্ডীর কংগ্রেসকে। মুখে এক, কাজে এক। ভোটে বয়কট আবার রাজশেখর মমতা এদের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখার বাসনা - এগুলো কি রাজনৈতিক সুবিধাবাদ নয়?

দ্বিতীয় আত্মসমালোচনা অর্থাৎ যৌথ কর্মসূচীর নামে মমতার সভায় ব্যাপকভাবে লোক পাঠানর বিষয়। এখানে কথা হোল কি ধরনের যৌথ কর্মসূচী ছিল— তা কার সঙ্গে কার যৌথ? নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখে শাসকশ্রেণির পার্টির সঙ্গে কখনও কখনও দাবিভিত্তিক যৌথ কর্মসূচী হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে যৌথ সিদ্ধান্ত থাকবে, দাবিগুলি নির্দিষ্ট থাকবে, যৌথ নিয়মকানুন থাকবে। এতে সাধারণত কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু তারা কি তা করেছিলেন? তাহলে কোন্ কোন্ লিখিত দাবির ভিত্তিতে তারা যৌথ কার্যকলাপ করেছিলেন তা জনসমক্ষে আনুন। আসলে তারা তা করেন নি। মমতার প্রতি মোহবশত মমতার জনসভায় লোক ভরিয়েছেন। বাস্তবত মমতার লেজুড়বৃত্তি করা হয়েছে, যৌথ কার্যকলাপ নয়। কাজেই এর ফলে

মমতার দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার বদলে অন্য কি ঘটবে?

তৃতীয় আত্মসমালোচনা শান্তি বার্তা সম্পর্কিত। এতবছর বাদে তারা বলছেন যে সাধারণ সম্পাদকের শর্ত না মানলে আলোচনায় না যাবার বিষয়। সংশয় এটাই যে বিষয়টি এমন নয় যে শান্তি বার্তা মাত্র একদিনের ছিল। এটা বেশ কিছুদিন ধরে চলেছিলো। যখন শর্ত লঙ্ঘন করে আলোচনা চলছে তাহলে মাওবাদীদের কেন্দ্রীয় কমিটি বা সাধারণ সম্পাদক হস্তক্ষেপ করেন নি কেন? এতদিন বাদে অজানা লোকজনের উপর আলোচনার দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে চলবে কেন? কি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল এটাও লোকজনের জানা দরকার। বিশেষ করে রিভলিউশনারী উদ্যোগের যুবরা এ ব্যাপারে ধ্যান রাখবেন আশা করি। যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তার কিছু কথা এরকম। ''জঙ্গলমহল অস্ত্র মুক্ত হলে ও শান্তি ফিরে এলে ওখান থেকে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার করা হবে।" ''জঙ্গলমহল তথা গোটা পশ্চিমবঙ্গে সব পক্ষকে অস্ত্র সংবরণ করতে হবে। অস্ত্র উদ্ধারে সরকার আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। যারা অস্ত্র সমর্পণ করতে ইচ্ছুক, সরকার তাদের সামাজিক পুনর্বাসন সহ বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ দেবে।" কোথায় রইল বিনাশর্তে অবিলম্বে যৌথবাহিনী প্রত্যাহারের দাবি? অন্য কিছু মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন মমতার উপর অত্যধিক মোহ নেতাদের কোথায় টেনে নিয়ে যেতে পারে এই কালাচুক্তি তার নিদর্শন।

চতুর্থ আত্মসমালোচনা অর্থাৎ গ্রাম ও আঞ্চলিক স্তরে জনগণের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে না তোলা। জনগণের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মানে কি? না জনগণের রাজত্বের সংগঠন। বিপ্লবী কমিটি আবার জনগণের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, তাদের কি আন্তঃসম্পর্ক সেগুলো নিশ্চয়ই ভাবা যায়। সরকারী তন্ত্র অচল করার পাশাপাশি জনগণের রাজের কথাটা অবশ্যই ভাবতে হবে। এর আগে জনগণের রাজ প্রকৃত অর্থে চালনার জন্য ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। নতুন রাজনীতি সামাজিক ব্যবস্থা চালু করতে গেলে পুরোনো অর্থনীতিকে (সংস্কারের পথে নয়) বিপ্লবী পথে ভেঙে নতুন অর্থনীতি গড়ে তোলার বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। কমিটিগুলিতে শ্রেণি আধিপত্যের বিষয়গুলিও আলোচিত হয়েছে। সঠিক কর্মসূচী সঠিক শ্রেণিদৃষ্টি না থাকলে এই কমিটিগুলি গড়লে জনতার ক্ষমতার প্রকৃত হাতিয়ার না হয়ে, হয়ে উঠত শ্রেণি আধিপত্যের নামে পার্টি বা স্কোয়াডের আধিপত্য তথা আঞ্চলিক কিছু নেতার ব্যক্তিগত কর্তৃত্বের হাতিয়ার। তাছাড়া হয়ে উঠতো তৃণমূল সহ অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্রীড়নক।

পঞ্চম আত্মসমালোচনা হল গুপ্ত ভাবে খুন করে লাশ গায়েব করা সম্পর্কিত। এটা কমঃ মাও সে তুং-এর শিক্ষার ঘোর বিরোধী। যুদ্ধে-মৃত্যুর কথা আলাদা, অন্যান্য ক্ষেত্রে বাছাই করে অত্যন্ত সাবধানে, ব্যাপক জনগণের মতামত তথা রায় সাপেক্ষে চরম অত্যাচারী অসংশোধনীয় মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে চরমদণ্ড কার্যকর করার কমরেড মাওয়ের যে লাইন তার লঙ্ঘন। জনগণ থেকে গুপ্তভাবে এই ধরনের কার্যকলাপ ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদ ছাড়া কিছুই নয়। আসলে মূল্যায়নটিতে যে বিষয়টি অনুপস্থিত তা হলো দুর্বল পার্টি কমিটি ব্যবস্থা। সঠিক মতাদর্শের ভিত্তিতে শক্তিশালী পার্টি কমিটি ব্যবস্থা যদি না থাকে, পার্টি যদি বন্দুককে কম্যান্ড করতে না পারে, তাহলে বন্দুকই পার্টিকে চালাবে। স্কোয়াডই হয়ে দাঁড়াবে নিয়ামক, ফলে রাজনীতি বিহীন এই ধরনের নির্বিচার হত্যা ইত্যাদি ঘটতেই থাকবে।

উপসংহার হিসাবে বলি যে, এই বিতর্ক নিজেদের পান্ডিত্য ফলানোর জন্য নয়, অন্যান্যদের খুঁত ধরার মানসিকতা থেকে নয়। নিউ ডেমোক্রেসি আন্তরিক ভাবেই বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশ চায়। সমস্ত ভুল ভ্রান্তি সত্ত্বেও আমরা সিপিআই (মাওবাদী) কে কমিউনিস্ট বিপ্লবী বলে মনে করি। আমরা আশা করি সকলে বিষয়গুলি আরো গভীর ভাবে ভাববেন। আমাদের তোলা বিষয়গুলি বিশেষত পার্টি কমিটি ব্যবস্থা, ঘাঁটি এলাকার বিষয়, কৃষি বিপ্লবের প্রশ্ন, শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গী ও গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকের নেতৃত্ব, যুক্তফ্রন্টের প্রশ্ন, বন্দীমুক্তির বিষয় ইত্যাদি। আরো কিছু বিষয় যেগুলো আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যেমন ঝাড়খণ্ড সহ বিভিন্ন পার্টি গুলোর সঙ্গে সম্পর্ক, জ্ঞানেশ্বরী প্রকরণ ইত্যাদি সম্পর্কেও আমরা মূল্যায়ন চাইব। আশাকরি সমবেত ভাবে আমরা সঠিক পর্যালোচনায় পৌঁছাবো।